চিরায়ত বই

২

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : মে ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Shesher Kabita a collection of novel by Rabindranath Tagore Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: May 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96486-7-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

গ্রন্থপরিচয়

শেষের কবিতা ১৩৩৫ সালে রচিত ও প্রবাসী পত্রের ভাদ্র হইতে চৈত্র সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে।

শেষের কবিতার 'নির্ঝরিণী' (মহুয়া কাব্যে এই নামে সংকলিত) কবিতাটি (দ্রষ্টব্য পৃ ৩১৫-১৬) স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যগ্রন্থে গৃহীত হইলে, অনেকে অর্থজিজ্ঞাসু হইয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। সুনীলচন্দ্র সরকারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

শেষের কবিতা গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে তার ঝর্নার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য-উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে।

—রবীন্দ্রনাথের পত্র। ৫ বৈশাখ ১৩৪৩

এইরূপ অন্যান্য পত্রের উত্তরে 'নির্ঝরিণী' সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রকাশ করেন—

শেষের কবিতায় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝর্নার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের

* আনন্দবাজার পত্রিকা -সম্পাদক-সমীপে। সবিনয় নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে আমার 'নির্ঝরিণী' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। ছাত্রেরা অনেকে জানাচ্ছেন মানে বোঝা গেল না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পত্রে বোঝাতে গেলে অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড়ো হয়ে ওঠে—অর্ডিন্যান্সের কয়েদীর মতো শেষ মেয়াদ সম্বন্ধেও অনিশ্চিত থাকতে হয়। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বক্তব্যটি পাঠানো গেল, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করে আমার দায় লাঘব করবেন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক্—তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও, তোমার প্রেমের যে বাণী নিত্যকারের। অর্থাৎ, তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো, সত্য করো।

তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহবেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।

এক কথায় এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—রবীন্দ্রনাথের পত্র। ৩ ভাদ্র ১৩৪৩

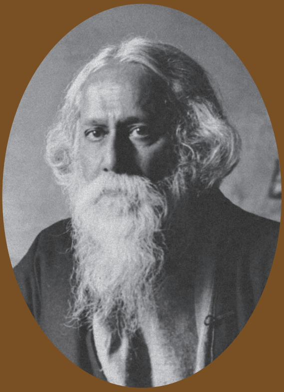

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ মে ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র।
কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতার সঙ্গ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কৈশোরে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই মহিলার স্নেহস্মৃতি লালন করেছেন।
তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *বনফুল* (১৮৭২) এবং *কবিকাহিনী* (১৮৭৮)। এইগুলি তাঁর উন্মেষ পর্বের রচনা। *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১) নাটক, *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২), *প্রভাতসঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) প্রভৃতি রচনা থেকেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ। ১৮৯০ সালে *মানসী* কাব্যের প্রকাশ। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজনীশক্তি বিচিত্রপথে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।
১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কবিতার *Gitanjali* নামে ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। মূলত এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন।
৭ আগস্ট ১৯৪১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

১
অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা করে অমতি এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.'র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মন অক্স্‌ফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে,

স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশন তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা 'বিষবৃক্ষে', বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা 'মনোমোহনের মোহনবাগানে', নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত। অক্স্‌ফোর্ডের বি.এ.'র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে"।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না—বলত, "রেখে দাও তোমার অক্স্‌ফোর্ডের পাস।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম.এ.; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, "অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি!

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক্ পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে

নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে; কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই; কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা,

শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্‌ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, “গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।”

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল : কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে

লিলি হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।"

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।"

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।"

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ.-তে বটানিতে ফার্‌স্ট্। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়সজন অমিতের বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উল্‌টো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে—ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উল্‌টো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল; ও বলে উঠল, “বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল—কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের ’পরে বিশ্বাস নেই।”

একদা মেয়েদের ’পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, “পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।”

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, “মানে কী হল।”

অমিত বললে, “যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।”

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ ’পরে। একজন সেকেলেগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, “কবিমাত্রের উচিত পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, ‘আনো ফজলিতর আম।’ বলব, ‘নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।’ ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও

চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমারবতী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।”

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, “সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?”

“একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মনভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে